বাজে গল্প

ত্রিদিব সেনগুপ্ত

১।। পিঠে চড়া কুকুরের গল্প

দিয়া বলল, আমি কখনো যাইনা পাঁচিলের পাশের দিকে, ওদিকে শুঁয়োপোকা আছে না, লেগে যাবে তো। হাতে পায়ে গায়ে, উঃ বাবা।

দীপঙ্কর বলল, কেন, শুঁয়োপোকা লাগলে কী হয়?

ও খুব একটা জানেনা, শুঁয়োপোকা লাগলে ঠিক কী হয়, লাগেনি কখনো ওর। কিন্তু সেটা তো প্রকাশ করা যায় না, তাই একটু মুখটা বিকৃত করল। উঁ, বিচ্ছিরি।

তার চেয়ে তুই শুঁয়োপোকা পুষলেই পারিস। এটা কিন্তু ভালো প্ল্যান, তুই বরং একটা শুঁয়োপোকা পুষে দেখ।

হুঁ, কী যে বলো, শুঁয়োপোকা কেউ পোষে নাকি। তুমি সব বাজে বাজে কথা বলো, দীপঙ্কর। 'বাজে' বলার সময় ঠোঁটে একটা ভঙ্গীও এল। যেন ওর সামনে ঠিক উচ্ছে না, পাকা কলা খেতে দিয়েছে, আর ও আপত্তি করছে। আর, 'দীপঙ্কর' – অত বড় নামটা এক নিশ্বাসে বলতে গিয়ে ওকে বেশ মনোসংযোগ করতে হয়, তাই, একটু ঝুঁকেও আসে সামনে।

কেউ তো তোর মত ঠান্ডা পড়তে না পড়তেই দুটো সোয়েটার পরেও ঘোরে না। কেউ পোষে কিনা তাই দিয়ে কী হবে? তুই পোষ। বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো শুঁয়োপোকাদের সংসার।

আবার বাজে বাজে কথা বলছ? এরকম করলে আমি কিন্তু আর কথা বলব না, চলে যাব এখান থেকে। এবার ওর কথায় ভঙ্গীটা তো বটেই, গলার আওয়াজটাও একটা রকমের হয়ে গেল, সেই ভঙ্গীটা চেনে দীপঙ্কর, দিয়ার মায়ের।

তুই? কথা বলবি না? সত্যি? কথা দিচ্ছিস?

এবার একটু ঘোলাটে হয়ে গেল দিয়ার প্রতিক্রিয়া, ঠিক কী বলবে বুঝতে পারল না। ওকে যে খুব একটা সম্মান করা হচ্ছে না কথাটায়, সেটুকু বুঝতে পারছে, কিন্তু একটু গোলমেলে লাগছে ওর। একটু চেয়ে রইল, খোম্বা মত মুখ করে। তারপর আঙুল তুলে বলল, চুপ চুপ চুপ করো। বললাম তো, আমি শুঁয়োপোকা পুষব না।

তাহলে তুই কুকুর পোষ। তার কাজ কিন্তু সব তোকে নিজে করতে হবে। পারবি? নইলে তোর বাবা-মা এসে আমাকে পেটাবে, এই সব বুদ্ধি দিয়েছি বলে।

দিয়ার চোখটা একটু অন্যরকম হয়ে গেল। দীপঙ্করের মাথার সামনে, ওর ডানপাশে আলমারিটার দিকে তাকাল। প্রসঙ্গটা ওর ভালো লাগছে, দীপঙ্করের গায়ে একটু ঘেঁষে এল, একটু হেলান দিয়ে। ডান হাতটা উঠে গেল ওর, হাওয়ার গায়ে যেন একটা কাঁচ আছে, ও তার গায়ে ধুলো সরিয়ে ওপাশটা দেখছে, তারপর বলল, মনে আছে আমার, তুমি পুষেছিলে না, কাতুকুতু।

একটু বিপন্ন বোধ করল দীপঙ্কর। কাতুকুতুর প্রসঙ্গে কোনো বেদনা উঠে না আসে। কাতুকুতু একটা বাচ্চা কুকুর। প্রায় বছর দেড়েক আগে, এক বর্ষার রাত্তিরে, বাড়ি ফেরার সময়, কাদামাখা অবস্থায় দীপঙ্কর ওকে তুলে এনেছিল। গোলগাল গাবদা একটা কুকুরছানা। পরের দিন দিয়া এসেছিল। সেদিন সারাটা দুপুর বিকেল সন্ধে দিয়ার একমাত্র ফোকাস ছিল কাতুকুতু। বারবার ওকে নিয়ে কথাও বলছিল দিয়া, দীপঙ্করও বেশ ফূর্তি পাচ্ছিল, ওর নাম দেওয়ার এই সাফল্যে।

পরের দিন কাজ থেকে ফিরে আর কাতুকুতুকে খুঁজে পায়নি দীপঙ্কর। আশে পাশের বাড়িরও কেউ কিছু বলতে পারেনি। কেউ খেয়ালই করেনি। সামনে একটা বাড়ি বানানো হচ্ছে, তার এক জন যোগাড়ে বলেছিল, ওই খানে এসে নাকি কাঁদছিল কুকুরটা, ওরা এক জন একটু রুটিও খেতে দিয়েছিল, খায়নি। তারপর আর কেউ জানে না।

সেই সময়টায় খুব ভয় পেয়েছিল দীপঙ্কর, দিয়া কী ভাবে নেবে। নিজের মধ্যে খুব খারাপ লাগছিল, সেটাই বোধহয় দিয়ার মধ্যে হওয়ার কথা ভেবে ভয় পেয়েছিল। তারপর, দিয়া যেই জিগেশ করল, কাতুকুতু কোথায় গেল, এক ঝলকে উত্তরটা মাথায় চলে এল দীপঙ্করের, ওর মার কাছে চলে গেছে। ওর মা ওকে নিয়ে গেছে।

ওর মা কোথায়, জানতে চেয়েছিল দিয়া। তার ঠিক কী উত্তর দিয়েছিল মনে নেই দীপঙ্করের। বাচ্চাদের কাছে 'জানিনা' গোছের অনিশ্চিত উত্তর দিতে ভালো লাগে না, তাই বোধহয় 'অনেক দূরে' গোছের কিছু বলেছিল। আর তখন আরো দেড় বছর ছোট ছিল দিয়া। সেই স্মৃতিটা কী ভাবে কাজ করবে ওর মাথায়, ঠিক কী প্রশ্ন করতে পারে, তার কী উত্তর দেবে, সেটা নিয়ে একটু ঘাবড়াল। তাড়াতাড়ি কথা পাল্টাল।

না, কাতুকুতু না, অন্য কুকুর পোষ।

কোথাও একটু ফাঁক রয়ে যাচ্ছে, সেই ফাঁকটা তাড়াতাড়ি ভরাট করতে চাইল দীপঙ্কর। তুই একটা সোনালি রঙের কুকুর পোষ।

আবার বাজে বাজে কথা বলছ? কী সব বলো, সোনালি রঙের কুকুর। ওসব হয় না।

হয় না কী রে? তুই সোনালি কুকুরের গল্প শুনবি?

সচরাচর বাঘ বা শেয়াল বা 'দিয়ার মত একটা মেয়ের' গল্প শুনতে যতটা আগ্রহ হয় দিয়ার, ততটা দেখা গেল না বটে, 'সোনালি কুকুর' জাতীয় একটা বিদ্ঘুটে জিনিসের গল্পের উপর ও বোধহয় খুব ভরসা করতে পারছিল না, তবু, যতই হোক, গল্প তো। মন্দ কী? হালকা গোলাপি ফ্রকের নিচে লাল পায়জামা পরা পা ভাঁজ করে বেশ গুছিয়ে বসল।

সে অনেক হাজার বছর আগের কথা। মধ্যমগ্রাম রেল ইস্টিশনের পাশের জায়গাগুলো তখন সব ফাঁকা ফাঁকা। এত গাড়ি নেই, এত লোক নেই, এত বাড়ি নেই। ঠিক ইস্টিশনের প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁষেই স্টেশন মাস্টারের লাল বাড়ি, তারপরে একটা মাত্র দোকান। মেনো পাইকের চা-এর দোকান। শুধু চা না, সেখানে লোক বিস্কুট খায়, ডিমভাজা খায়, সিগারেট কেনে।

ওই যে তোমার সিগারেট। হাত দিয়ে দেখাল দিয়া। তুমি সেদিন বাথরুমে ফেলে এসেছিলে না, আমি নিয়ে এলাম।

নিয়ে এলি আর এমন জল লাগালি যে ওগুলো আর খাওয়াই গেল না।

তারপর বলো, সেই ডিমভাজা, সিগারেট –

ডিমভাজা খায়, সিগারেট খায়, গল্প করে, চা খায়, অফিস থেকে নেমে। তারপরে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে তো। তখন তো এত ভ্যান, অটো এসব নেই। রাস্তাটা পুরো ফাঁকা, দুপাশে মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট ঝাঁকড়া গাছ। বেশিরভাগই তেঁতুল গাছ। তাতে বড় বড় সব বাঘ থাকে। সে অবশ্য অন্য গল্প।

দিয়া হেলান ছেড়ে উঠে বসল, বাঘের গল্পটা বলো।

দীপঙ্করের আগেই মাথায় এসেছিল কেলেঙ্কারিটা। কিন্তু বলতে বলতে আর সামলাতে পারেনি। বাঘের কথা বললেই ও বাঘের গল্প শুনতে চাইবে। তাড়াতাড়ি, বেশ একটু কর্তৃত্ব গলায় এনে বলল, এখন আগে কুকুরের গল্পটাই শোন।

মন্দের ভালো গোছের মুখ করে দিয়া আবার হেলান দিল দীপঙ্করের গায়ে।

তা, লোকগুলো তো রোজ মেনো পাইকের দোকানে এসে বসত, থাকত অনেকটা সময়। ওদের যাতে ভালো লাগে, সেই জন্যে, ছটা সোনালি কুকুর করল কী, মেনো পাইকের চায়ের দোকানের ঝুলবারান্দায় বসে গানবাজনা শুরু করল। সবাই মিলে। লোকেও বেশ পছন্দ করত। সময়টা ভালোই কেটে যেত তাদের।

কিন্তু ছটা কুকুরের ছটাই তো আর গান গাইতে পারত না। দু-তিনজন গান গাইত, আর প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বাজাত, হয় গিটার, নয় ড্রাম, বা অন্যকিছু। সব মিলিয়ে গানবাজনাটা চলত। এই ছটা কুকুরের মধ্যে একজনের ভাগে পড়েছিল একটা টিঙটিঙে তারের বাজনা। সেও অন্য কুকুরগুলোর মত একই রকম সোনালি। তারও চারটে পা, একটা লেজ আর একটা মুখ। কিন্তু অন্যদের যখন লোকে অবাক হয়ে দেখত, ওই দেখ গিটার বাজাচ্ছে, ওই দেখ, কেমন দুমদুম করে ড্রাম

বাজাচ্ছে, বা, ওই দেখো কি সুন্দর গান গাইছে, তার দিকে কেউ ফিরেও তাকাত না। খুব মন খারাপ থাকত তার। তার দুঃখের চোটে তার টিঙটিঙে বাজনাটাও যেন আরো সরু হয়ে বাজত।

মাঝে মাঝে, লোকজন ফাঁকা হয়ে এলে, বিশেষ করে চাঁদনি রাতে, চাঁদের আলোয় ঘুম আসত না যখন, ওউ ওউ করে তখন কাঁদত টিঙটিঙে বাজনার সোনালি কুকুর। তার আরো খারাপ লাগত এই ভেবে যে তার কিছু করারও নেই। কিছু করার থাকলে সে নয় করে দেখত। সবাই তো গানও গায় না, সবাই তো ড্রামও বাজায় না, সত্যিই তো, কী করার আছে তার? শেষে, অনেক দিন এমন দুঃখের সময় যাওয়ার পর, একদিন এক জন বাদামওয়ালা তাকে বুদ্ধি দিল, তুই বরং নিজের পিঠে চড়ে দেখ।

দিয়া বলল, সে আবার কি? আবার বাজে কথা বলছ তুমি, দীপঙ্কর?

দীপঙ্কর বলল, সেই টিঙটিঙে কুকুরটাও ওই একই কথা বলেছিল, তুই যা বললি। তখন বাদামওয়ালা তাকে বলল, দেখ, আমরা ট্রেনে ট্রেনে বাদাম বিক্রি করি, সারাদিন শুধু ঘুরে বেড়াই, সব ইস্টিশন সব লোককে চিনি আমরা। আমরা অনেক খবর রাখি যা সব লোকে রাখে না। সবাইকে এসব খবর আমরা চাইলেও দিই না। নেহাত তোমার বাজানোর হাতটা খুব ভালো, তোমার বাজনা শোনার পরই মনটা টনটন করে, তাই। টিঙটিঙে কুকুর বলল, তোমার তো বাজনার পরে হয়, আমার বাজনার আগেই মনটা টনটন করে, বাজনার পরেও করে। বাদামওয়ালা বলল, তা করুক, আসল কথাটা হল, নিজের পিঠে যদি চড়তে পারো, যা চাইবে তাই হবে। আমাদের সঙ্গেই এখন বাদাম বিক্রি করে বনগাঁ লোকালে, বলাই নাম, ও আগে পুরো পাগল ছিল, লোকের বাড়ির বেড়ায় উঠে বসে থাকত। তারপর নিজের পিঠে চড়ল বলেই সবটা বদলে গেল। ও চেয়েছিল বাদামওয়ালা হতে, হয়ে গেল।

টিঙটিঙে কুকুরের আরো কত কিছু জিগেশ করার ছিল। বলাই আরো বিরাট, সত্যিকারের বিরাট কিছু হতে চাইল না কেন, বাদাম বিক্রি না-করে বাদামচিট বিক্রি করতেও তো চাইতেই পারত। বাদাম আর কি, বাদামের চেয়ে বাদামচিট অনেক ভালো খেতে, সবাই অনেক ভালো খায়। তুইও তো ভালো খাস বাদামচিট?

না, আমি ওসব খাই না। দিয়ার মুখ দেখেই বোঝা গেল, বাদামচিট ও চেনে না।

খাবি কি, তুই তো চিনিসই না। যাকগে, যা বলছিলাম। টিঙটিঙে কুকুরের আরো কত কী জিগেশ করার ছিল। নিজের পিঠে চড়বে কী করে, তার কায়দাগুলো যদি জানে বাদামওয়ালা, কিন্তু তার আগেই ট্রেন এসে গেল। লাস্ট ট্রেন। গানবাজনা চলতে চলতেই অনেকটা রাত হয়ে গেছিল। কিন্তু সেদিন রাতে খুব শান্তিতে ঘুমোলো টিঙটিঙে। দু দুবার চাঁদ উঠল সেই রাতে, কিন্তু তার ঘুম একবারও ভাঙল না। সারা রাত ঘুমের মধ্যে একটা হালকা হাসি লেগে রইল মুখে। তোর মুখে যেমন থাকে, তুই যখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বাঘকে বিয়ে করিস, বাঘ তোকে মাছের ঝোল রেঁধে খাওয়ায়। নাকি বাঘ তোকে বিয়ে করে, আর তুই বাঘকে মাছের ঝোল রেঁধে খাওয়াস? তুই রোজ তোর পিসিকে গুল মারিস, না রে দিয়া? স্বপ্ন দেখা কাকে বলে, জানিস তুই?

স্বপ্ন দেখা তো নয়ই, দিয়া বোধহয় গুল-মারা ব্যাপারটাও বোঝে না, তাই কথা ঘোরাল, তুমি একদিন একটা বাচ্চা বাঘের গল্প বলেছিলে। একটা ঝর্ণা, হারিয়ে গেল ...

হ্যাঁ, তারপর, পরের দিন সকাল থেকে টিঙটিঙের এক মাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল, কী করে নিজের পিঠে ওঠে, সেটা বার করা। নিজের পিঠ আর ঘাড় আর গলা আর পেট, সবকিছু বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে কসরত করতে করতে একেবারে নাজেহাল হয়ে গেল। দিন রাত, দিনের পর দিন, শুধু এই করেই চলেছে। ওর বাজনার দলের আর কুকুরেরা, মেনো পাইকের দোকানের সবাই, ট্রেনের লোকজন সবাই ওকে নিয়ে হাসাহাসি করে। দেখো সোনালি কুকুরটা পুরো ক্ষেপে গেছে। ওর গানবাজনার দল থেকেও ওকে বার করে দিল। পাগলা কুকুর আর কে চায় গানবাজনার দলে।

টিঙটিঙে কিন্তু লেগেই রইল। অত কসরত করতে করতে তার বাজনার মত শরীরও গেল টিঙটিঙে হয়ে। কিন্তু সে লেগেই রইল। এই রকম সময়ে হঠাৎ করে একদিন তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। ইস্টিশনের পাশেই মধ্যমগ্রাম বয়েজ ইসকুল তখন তৈরি হচ্ছে। মিস্তিরিরা কাজ করছে। দেওয়াল ছাদ তখনো হয়নি, শুধু বেঞ্চি, ব্ল্যাকবোর্ড আর চকগুলো তখনো বানানো হয়েছে তাদের। সেই চকের থেকে একটা নিয়ে এল টিঙটিঙে। এসে, মেনো পাইকের দোকানের ঝুল বারান্দায় চকের দাগ দিয়ে একটা বড় জায়গা ঘিরে নিল, তার মধ্যে বড় বড় ঝকঝকে অক্ষরে লিখল "আমার পিঠ"। এবার আর তার নিজের পিঠে চড়ে বসার কোনো অসুবিধা রইল না। এত দিনের চেষ্টার পর উপায়টা পেয়ে গিয়ে এত ফূর্তি হল টিঙটিঙের যে সেদিন সারাটা দিন নিজের পিঠের উপর সে তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়েই চলল।

কিন্তু গানবাজনার দলে ভালো জায়গা আর কোনও দিনই হল না সোনালি কুকুর টিঙটিঙের। ভালো কেন, কোনও জায়গাই হল না, কারণ, দলটাই ততদিনে উঠে গেল। এর মধ্যে আসলে অনেক হাজার বছর কেটে গেছে। নিজের পিঠে চড়ার চেষ্টায় টিঙটিঙে কোনোদিন খেয়ালই করেনি। মেনো পাইকের দোকানটাই উঠে গেছে, মানে উঠে কোথাও যায়নি, কোথায় বা যাবে একটা দোকান আর তার জমি, দোকানটাই উবে গেছে কত শো বছর হল। এখন সেখানে অটোস্ট্যান্ড। শেষদিকে মেনো পাইকের দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেছিল, বাড়ির দাওয়ায় শীতকালে রোদে আর গরমকালে ছায়ায় বসে থাকত, মনে আছে টিঙটিঙের, কসরত করতে করতে দেখেছে কতবার। সেই বাড়ি ভেঙে এখন ফ্ল্যাটবাড়ি। এখন অটোস্ট্যান্ডের যে মালিক সে আর মনেই করতে পারে না মেনো পাইকের নাম। যদিও তার নামও পাইক দিয়ে, পানু পাইক। শোনা যায় তার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা নাকি মনে করতে পারত, হ্যাঁ, ঠিকই মেনো পাইক বলে ছিল বটে একজন, তাদের বংশের পূর্বপুরুষ, তারই জমি বটে এটা, সে নাকি এখানে চায়ের দোকান করেছিল, ইতিহাস বইয়ে সেরকমই আছে বটে, ছেলে মেয়েরা পড়া মুখস্থ করে, তা থেকেই শুনেছে। তারই পত্তন করা এই দোকান। এখন চারদিকে কত ভিড়, গাড়ি, ফ্লাইওভার। দোকানে বসে গানবাজনা শোনার আর লোক কই?

টিঙটিঙেও কোথায় চলে গেল একদিন, অন্য সব সোনালি কুকুরের মত। ওর একটা সেলফোন আছে, কিন্তু তার নম্বর কেউ জানে না।

গল্পটা কেমন লাগল এটা দিয়াকে জিগেশ করার আগেই ওর পিসি ওকে খেতে ডাকল। তবে পরের দিনে সকালে ওকে টেবিলের সামনের চৌকো জায়গাটায় ঘুরে ঘুরে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে দেখে দীপঙ্করের মনে হল, বোধহয় টিঙটিঙের কথা মনে পড়ছে ওর।

২।। দেঁতো ঘোড়ার গল্প

সোনালি কুকুরের নিজের পিঠে চড়ার গল্পটা দিয়ার অবশ্য ভালই লেগেছিল। পরে দিয়ার পিসি, দীপঙ্করের বৌ দীপঙ্করকে বলেছিল, দিয়া বলেছে, কুকুরের, দীপঙ্করের ওই কুক-কুকুরের গল্পটা বেশ ভাল। ঠিক তোতলা নয়, কিন্তু একটা বাড়তি মনোযোগ এসে যায় দিয়ার প্রথম অক্ষরটা বলতে গিয়ে। তাই 'ক'-এ চাপ দিয়ে ও ঠিক কী ভাবে বলেছে সেটা মাথায় আওয়াজ আকারেই বেজেছিল দীপঙ্করের।

রাতে শোয়ার সময়, ঘরের বড় আলো অফ করে, টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে, একটা বই নিয়ে দিয়ার পাশেই শুল দীপঙ্কর। ওকে পাহারা দেওয়াও হবে, আর ঘুমিয়ে পড়লে নিজেও পাশে শুয়ে পড়তে পারবে। দিয়া সবসময়ই কিছু না কিছু করছে। তখন সে ইশকুলে কার্সিভ টানা হাতের অক্ষরে এ বি সি ডি কী করে লেখে সেগুলো দেখাতে চাইছিল দীপঙ্করকে। তার মধ্যে একটা লড়াইও ছিল। দীপঙ্করের পৌরাণিক ছেলেবেলায় প্যারী চাঁদ সরকারের, সরকারই বোধহয়, বা প্রায় ওই রকমই নামের কোনো লেখকের একটা পাতলা বই ছিল। তার গায়ে ব্রাউন পেপারের মলাট দেওয়া, তখন যার নাম ছিল বাঁশ কাগজ। তার গাঢ় সবুজ রংটা ময়লা হয়ে প্রায় কালচে একটা সবুজ হয়ে গেছিল। সেই বইয়ের পিছন দিককার পাতাগুলোয় ছিল টানা হাতের ইংরিজি অক্ষর, সেখান থেকে অভ্যেশ করতে হয়েছিল। তা থেকে যা শিখেছিল তাতে দীপঙ্করের নিজের সময়েও ইশকুলের দিদিমণিরা বেশ বিরক্ত হত। যা হয়, ইশকুলের দিদিমণিরা, তাদের লেখাপড়াটা সবই খুব উপর উপর, অত খোঁজ রাখেন না, অত কুলীন ব্রিটিশ রকমের টানা হাতের লেখার অনেক অক্ষরই তারা চিনতে পারতেন না, বিশেষ করে এস অক্ষরটা। একবার এক দিদিমণি কেটেও দিয়েছিলেন, এতটাই অন্য রকম সেগুলো, পরিচিত অক্ষরের থেকে। আজ বহু বহু বছর, বছর চল্লিশেক বাদে, আবার সেই আপত্তি ফেরত আসতে দেখল দীপঙ্কর দিয়ার কাছ থেকে। এবং আবার মূল আপত্তি সেই এস।

এইসব কী উল্টোপাল্টা লিখছ, এটা একটা এস হল, ম্যাম এরকম বলেনি।

তোর ম্যাম কিছু জানে না।

এই বার রীতিমত ক্ষেপে গেছিল দিয়া, এবং সত্যিই একটু তোতলামি এসেছিল ওর কথায়। ত-তুমি কিছু জানো না, ম্যাম জানে। এতে কী যে বলবে, ঠিক খুঁজে পাচ্ছিল না দীপঙ্কর। শেষে বলেছিল, তুই জানিস, তোর ম্যাম যেমন পড়ায়, আমিও পড়াই, বড়দের ইশকুলে। এতে একটু মজা পেয়েছিল দিয়া। তোমাকে ম্যাম বলে – ম্যাম না ম্যাম না, স্যার বলে ডাকে তোমায়? এই প্রসঙ্গটা একটু অপরিচিত লেগেছিল দীপঙ্করের। দিয়ার মা কি কখনো ওকে নিজের ইশকুল কলেজের গল্প করেছে, সেখানের স্যারদের? নয়তো ওর মাথায় এটা কী করে এল?

কিন্তু অন্য প্রসঙ্গ এসে যাওয়ায় একটু স্বস্তি পেয়েছিল দীপঙ্কর। তাড়াতাড়ি কাগজ আর পেনটা কিছু না বলেই সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, ঘুমোতে যাওয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে দিয়ার। না, দাঁড়াও, তোমায় দেখাচ্ছি, কী করে লিখতে হয়। লড়াইটা সাঙ্গ না করে কী করে ঘুমোতে যায়, অনেক বেগ পেতে হয়েছিল দীপঙ্করকে ওই কাগজ পেন আর কার্সিভ মাথা থেকে সরাতে। তাই, দিয়াকে গল্প শোনানোর প্রস্তাবটা নিজেই দিল।

আজ কিসের গল্প শুনবি?

বাঘের।

উঃ, তোর এই বাঘ, পৃথিবীতে অত বাঘ নেই রে। বাঘরা সব হারিয়ে যাচ্ছে, সেই বাঘের ছানাটা যেমন হারিয়ে গেছিল, পাহাড় পেরিয়ে, ঝর্ণা পেরিয়ে, অচেনা বনে। আমরা যেমন রাস্তা চিনি, বাড়ি চিনি, বাঘেরা চেনে জঙ্গল। ওদের তো বাড়িও জঙ্গল, রাস্তাও জঙ্গল, দোকানও জঙ্গল, জঙ্গলেই থাকে, জঙ্গলেই ঘোরে, জঙ্গল থেকেই খাবার নিয়ে আসে। তাই এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে গেলে ওরা আর কিছু চিনতে পারে না। আর, শুধু একটা জঙ্গল না, সব জঙ্গল থেকেই বাঘ হারিয়ে যাচ্ছে। দীপঙ্করের নিজের মাথার গম্ভীর অন্য ভাবনার বোধহয় ছায়া পড়েছিল, সেটা এড়াতে, বা হয়তো নিজে থেকেই, দিয়া বলল, তাহলে, তাহলে, অ্যালিসের।

অ্যালিসের গল্প আবার শুনবি কি? ওটা তো নিজেই দেখলি সেদিন। দেখবি নাকি আবার, সেইরকম?

অ্যালিস দেখার প্রসঙ্গটা তোলাতেই একটু ভিতু চোখে তাকাল দিয়া, তার মানে, ওরও বেশ তাজাতাজা মনে আছে সেদিনের কেলেঙ্কারি। দীপঙ্করের লেখার কাজ বন্ধ করে ল্যাপটপে অ্যালিস দেখাতে বলেছিল দিয়া। ও জানত অ্যালিসটা ওখানে তোলা আছে। যখন ডিভিডিটা এনকোড করছিল দীপঙ্কর, বারবার এসে জিগেশ করছিল এটা কী হচ্ছে, সিনেমাটা চলছে না, তাহলে কম্পিউটারের এই আলোটা জ্বলছে কেন। ডিভিডি ড্রাইভের আলোটা ও চেনে। দীপঙ্কর বলেছিল, এনকোড করছি সিনেমাটা। তাতে খুব বোদ্ধার মত বলেছিল দিয়া, ওঃ। তার একটু পরেই বলেছিল, কই দেখি কী হচ্ছে? সে আর দেখে ও কী বুঝবে, সারি সারি সংখ্যা উঠে যাচ্ছে মেনকোডারের। তখন দীপঙ্করই ওকে বুঝিয়েছিল, এতদিন পর্যন্ত সিনেমাটা শুধু ওই ডিভিডিটায় ছিল, এখন অনেক ছোট হয়ে এই কম্পিউটারের মধ্যে চলে এল, এরপরে ওটা একটা সিডিতেও নেওয়া যাবে। এটাও যে ও তেমন কিছু বুঝছিল, তা না, তাও, নিশ্চয়ই কিছু একটা বুঝে নিল। কারণ, তার পরেই বলেছিল, কই দেখাও সিনেমাটা। দীপঙ্কর একটু বাড়তি গম্ভীর গলায় কাজের কথা বলায় চলে গেছিল। চলে গেছিল কী করতে সেটা একটু বাদেই বোঝা গেছিল, ওর মায়ের চীৎকারে। গোটা টেবিল ক্লথের গায়ে মার্কারের হিজিবিজি। ও নাকি সাজাচ্ছিল। পাছে খুব মার খায়, ততক্ষণে এনকোডিংটাও শেষ হয়ে গেছিল, নিজের কাজ বন্ধ করে ওকে এনে অ্যালিস দেখতে বসিয়েছিল দীপঙ্কর।

তুই দেখতে চাস?

হ্যাঁ, চাই, চাইছি তো।

দেখাতে পারি তোকে, একটা শর্তে, গোটা সময়টা একটাও কথা বলবি না। ঠিক আছে?

বলব না।

ভেবে নে আগে থেকে, যতক্ষণ না সিনেমা শেষ হয়, বা আমি নিজে থেকে কথা বলি, তুই একটাও কথা বলতে পারবি না। যদি বলিস তাহলে কী করব জানিস?

কী করবে দীপঙ্কর, মারবে? একটু ভিতু একটু তেল দেওয়া গলায় ঘাড় তুলে মাথা বেঁকিয়ে বলেছিল দিয়া।

মারব মানে, গদাম করে মারব, সারাদিন আর পিঠ বেঁকাতে পারবি না। দিয়া জানে এটা ফাঁকা ভয় দেখানো নয়, দীপঙ্কর পিসির মত মারে না, মারলে সত্যিই লাগে, কিন্তু জেদও তো করতে হবে। বলল, দেখবই, বলব না কথা। একটা কথাও বলব না, দীপঙ্কর। চালিয়ে দাও এবার।

দীপঙ্কর জানত, এটা চাইলেও করা প্রায় অসম্ভব ওর পক্ষে, ওর কথা বলার কারণ লাগে না, প্রায় কথা বলা টিয়াপাখির মত, বিনা কারণেই বলে। শেষে সত্যিই মারতে হয়, আগে থেকেই তাই সাবধানতা নিয়েছিল অনেক। ওর কানে কথা এলে ও কথা বলে উঠবেই, তাই হেডফোন লাগিয়ে দিয়েছিল ওর কানে। আর, নিজে নিজে বসে থাকলে কিছু না কিছু করতে উঠে যাবেই, তাই নিজেরই কোলে বসিয়ে সামনে চালিয়ে দিয়েছিল। এটা দীপঙ্করের নিজেরও শাস্তি হয়েছিল। হেডফোনটা

দিয়ার কানে, তাই ও কিছু শুনতে পাচ্ছে না। খুব ভালো দেখতেও পাচ্ছে না, এলসিডি স্ক্রিনে যা হয়, বেঁকিয়ে দেখা যায় না। আর পুরো সময়টা নিজের বুড়ো আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে থাকার মত, খেয়াল করে চলতে হচ্ছে দিয়াকে। প্রতি মুহূর্তে ও দেখতে দেখতে কিছু না কিছু একটা বলে উঠতে যাচ্ছে, পিছন দিকে উপরে ঘাড় বেঁকিয়ে, আর প্রতি বারই দীপঙ্করকে আঙুল তুলে ঠোঁটে এনে দেখাতে হচ্ছে, চুপ। একবার শুধু বলল, দীপঙ্কর, আমি একটু জল খাব। এটা যে ঘটতে পারে তা আগে থেকেই হিশেবে ছিল দীপঙ্করের। জানলার বাতায় জলের বোতল আর দিয়ার টুপির মত দেখতে গেলাশটা আগেই এনে রেখেছিল। মুখে আঙুল দেখিয়ে সেটায় জল ঢেলে দিয়াকে দিয়েছিল।

কিন্তু সত্যিই দিয়াকে পেটাতে হয়নি, পুরো সিনেমাটাই ও ওই ভাবে কোলে বসে দেখেছিল, একটাও কথা না-বলে। অসম্ভব অবাক হয়ে গেছিল দীপঙ্কর নিজেই। মজাও পেয়েছিল বেশ। দেখলি, তুই বেশ পারিস কথা না-বলে।

আজকে অ্যালিস দেখার কথায় বোধহয় সেদিনের কথা মাথায় এসে গেল দিয়ার, বিন্দুমাত্রও আর উৎসাহ দেখাল না। বলল, দীপঙ্কর, দীপঙ্কর, ঘোড়ার গল্প বলো।

কী বলবে সেটা খুঁজছিল দিয়া, এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। তাকের উপর ডোকরার ঘোড়াগুলোর গায়ে চিকচিক করছে টেবিলল্যাম্পের এই আবছা আলো। সেগুলো দেখেই বোধহয় ওর ঘোড়ার কথা মনে হল।

অন্তত বাঘের হাত থেকে তো বাঁচল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘোড়ার গল্প ভাবতে শুরু করল। ঘোড়ার গল্প যখন, শুরু হবে নিশ্চয়ই একটা ঘোড়া দিয়ে।

একটা ঘোড়া ছিল, খুব ঘুরে বেড়াত চারদিকে। অত ঘোরে বলেই তো ওদের নাম ঘোড়া। খুব ফূর্তিতেই ছিল। সব ঘোড়ার মতই ওর ঘাড় ভর্তি ছিল কেশরে। ফোলানো, ঝাঁকড়া ঢেউ খেলানো কেশর। কোনও দিন শ্যাম্পু করেনি, তাও। ঘোড়ারা আর শ্যাম্পু করবে কী করে, বাথরুম-ই নেই ওদের যে মা ঘাড় ধরে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে শ্যাম্পু করাবে, আর সেই শ্যাম্পুর ফেনা চোখে গিয়ে কেঁউ কেঁউ করে নাকে কাঁদবে।

এইখানটায় যে ওর প্রতি একটা কটাক্ষ করা হল এটা বুঝল দিয়া, এবং খিঁখিঁ করে একটু উপরচালাকির হাসি হাসল।

আর শুধু তো কেশর না, অন্য ঘোড়াদের মত এই ঘোড়াটারও ছিল চারটে পা, এবং তাতে চারটে খটখটে খুর। ফূর্তি হলে যেমন একঘাড় কেশর রৈ রৈ করে ঝাঁকাত, চটে গেলে আবার খুর ঠুকত। খুরে মাটিতে শব্দ উঠত খটাখট খটাখট খটাখট। তবে শুধু যে রেগে গেলেই ঠুকত তা নয়। পাথুরে চাটানে কী শক্ত রুক্ষ মাটিতে চলার সময়ও আওয়াজ উঠত। ঘোড়ার বেশ ভালই লাগত। আরো যখন একা একা হাঁটত, মনে হত সে একা না, আরো কে একটা জানি আছে তার সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে ঘোড়ার বেশ নেশা চেপে গেল এই আওয়াজের। রাতে ঘুমোচ্ছে, আরো ঘোড়ারা তো দাঁড়িয়েই ঘুমোয়, একটু যেই ঘুম পাতলা হল, বেশ ক-বার পা ঠুকে নিল। আবার কখনো হয়ত কোনো তাড়া নেই, দুলকি চালে হাঁটলেই চলে, চলতে শুরু করল একদম পল্টনি দৌড়, ওতে তো খুরের আওয়াজ অনেক বেশি হয়। ক্রমে দেখা গেল, ঘোড়া বেশির ভাগ সময়ই দৌড়চ্ছে। কিন্তু অত দৌড় কি ঘোড়ার সয়? কত আর দৌড়বে? একটাই তো ঘোড়া। তখন সে দেখল, দৌড়ের চেয়ে অনেক ভালো হল নাচ। দৌড় মানে তো একই তালে খটখট খটখট খটখট। কিন্তু নাচ মানে কত তাতে তাল, কত লয়, কত আলাদা আলাদা ছন্দ। এক এক নাচ মানে এক এক আলাদা রকমের খটাখট।

ক্রমে নাচিয়ে হিশেবে বেশ নাম হয়ে গেল ঘোড়ার। অন্য নাচিয়ে ঘোড়ারা যেমন নাচবে বলে নাচে, এই ঘোড়া তো নাচে তার নিজের আনন্দে। নেচেই চলে, নেচেই চলে। দুবার তিনবার চারবার 'অবিরত নৃত্য প্রতিযোগিতা'-য় ফার্স্ট হল ঘোড়া, মানে যেখানে নেচেই চলতে হয়, নেচেই চলতে হয়, থামা চলে না। থামলেই আউট। আর সবাই আউট হয়ে গেলে যে রয়ে গেল সে হল ফার্স্ট। ফার্স্ট হলেই সব জায়গায় ফ্লাস্ক দেয়, ইস্তিরি দেয়। একা একটা ঘোড়া কত ফ্লাস্ক আর চা খাবে, আর ইস্তিরি করবে যে তার তো কোনো জামা প্যান্ট কোটই নেই, ঘোড়ার পাড়ার কাউকে আর ফ্লাস্ক বা ইস্তিরি কিনতে হয়নি বেশ কয়েক বছর। এক জায়গায় সে ফার্স্ট হয়ে একটা সঞ্চয়িতাও পেল। সেটা পেয়ে বেশ ফূর্তি হয়েছিল ঘোড়ার, এখন বেশ ছড়া কেটে কেটে নাচতে পারে। আজকাল আর কেন যে কেউ প্রাইজে বই দেয় না, ভাবে ঘোড়া।

এরকম করে নেচে নেচে, ছড়া কেটে কেটে, হেঁটে দৌড়ে বেশ অনেকটা জীবন কেটে গেল ঘোড়ার। একটা সময় খেয়াল হল ঘোড়ার, বয়স হচ্ছে। আজকাল বেশি নাচলে কি বেশিক্ষণ দৌড়লে বেশ হাঁফিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে রাতের দিকে হাঁটুতে ব্যথা করে, দু-চারটে করে সোনালি-সাদা কেশর পেকে কালো হয়ে যাচ্ছে। খারাপ লাগে না ঘোড়ার, ভালোই লাগে, কমবয়েসি কচি ঘোড়ারা অনেকেই আজকাল তাকে দেখলে পথ ছেড়ে দেয়, সমস্যায় পড়লে পরামর্শ নিতে আসে, ভালোই লাগে ঘোড়ার। কিন্তু নাচ ক্রমে ক্রমে তাকে ছেড়ে দিতে হল। ডাক্তারও বলল, আর নাচলে ভেলোরে গিয়ে অপারেশন করে আসতে হবে। একটা ঘোড়ার পক্ষে সে কি কম ঝক্কি। এমনি ট্রেনে তো ঘোড়াদের উঠতেও দেয় না।

অন্য ঘোড়াদের নাচতে দেখলে, লেজে কেশরে কোমরে একটু যে দোলা লাগে না এখনও, তা নয়। কিন্তু আর নাচে না ঘোড়া।

কিন্তু এই নাচ ছেড়ে দিয়ে মহা মুশকিলে পড়ল ঘোড়া। শুধু তার না, তার শরীরেরও তো অভ্যেশ হয়ে গেছে নাচ, অত বছর অত অত সে নেচেই গেছে। শরীর সামলে রাখা, হাত পা পেট সব নিজের নিজের নিজের মত নাচতে চাইলে তাদের আটকানো, এটাই এখন কাজ ঘোড়ার। কিন্তু সব সামলালেও একটা দাঁতকে সে কিছুতেই সামলাতে পারে না। ঘোড়ার সেই দাঁতটার নাম রসময়, মহা অবাধ্য সে, দিনরাত সে শুধু নেচেই চলে। একসময় ঘোড়া যেমন নাচত। ঘোড়া খুব একটা শাসনও যে করতে পারে, তাও নয়। সে তো নিজেও একসময় ওরকমই ছিল। কোথাও একটা মায়া হয় তার। মাঝে মাঝে রসময়ের নাচের চোটে খুব ব্যথা হয় তার। কিন্তু বারণ করলেও শোনে না রসময়। আজকাল মাঝে মাঝেই দাঁতের ডাক্তারের কাছে ছুটতে হয় ঘোড়ার।

ক্রমে ক্রমে সবাই জেনে গেল রসময়ের এই নাচের কথা। তার সেই তাথৈ তাথৈ নাচ দেখতে সবাই ভিড়ও করতে শুরু করল খুব। একসময় যেমন ঘোড়ার নাচ দেখতে করত। লোকের এই আসা, ভিড় করা, মজা পাওয়া – এগুলোয় খারাপ লাগেনি ঘোড়ার, তার খারাপ লাগল অন্য একটা জায়গায়।

ঘোড়ার নিজের কোনও নাম ছিল না, কখনও নামের কথা মাথায়ই আসেনি তার। নাম ছাড়াই বেশ তো ছিল। কখনও মনেই হয়নি নামের কথা। কিন্তু এখন তার পরিচয় হতে শুরু করল রসময়ের নামে। লোকে তাকে ডাকতে শুরু করল 'রসময়ের মাড়ি' বলে, কারণ, তার মাড়িতেই থাকে রসময়।

এইটা মনে খুব লাগল ঘোড়ার। সে একটা ঘোড়া, একটা আস্ত ঘোড়া, পা লেজ কেশর সহ একটা আস্ত জ্যান্ত ঘোড়া। আর লোকে তাকে জানবে 'মাড়ি' বলে, 'রসময়ের মাড়ি' বলে, এটা কিছুতেই মানতে পারছিল না ঘোড়া। মনে খুব কষ্ট হতে শুরু করল ঘোড়ার। মন খারাপ আর দাঁত ব্যথা, এই নিয়েই বাঁচতে শুরু করল ঘোড়া। কে তাকে দেখলে বলবে, এই ঘোড়াই এক সময় এমন নাচত যে কেশরগুলোকে আর আলাদা করে দেখাই যেত না, মনে হত যেন উঁচু পাহাড়ের গায়ে দমকা হাওয়ায় মেঘের ঝাপট।

দাঁতের ব্যথা সারাতে কত কিছুই তো করল ঘোড়া। মাড়ির গোড়ায় মলম, কুলকুচি। দাঁতের মধ্যে লবঙ্গ চেপে ঘুমোতে যাওয়া, কত কিছু। শেষ অব্দি দেখল একটা জিনিসেই কাজ হচ্ছে, যে কোনো কিছু খাওয়ার পরে, ভালো করে কুলকুচি করে একটু পেয়ারা পাতা চিবোনো। কিন্তু সেই বা কী কম ঝামেলা। ঘোড়ারা মোটেই গোরু নয় যে সারাদিন সারারাত জাবর কাটবে, কিন্তু ঘোড়ারা বার বার খায়। বার বার খাওয়া মানে বার বার পেয়ারা পাতা। কাছাকাছি সব পেয়ারা গাছের নিচের দিকের সব পাতা গেল শেষ হয়ে। সেই কোথায় উপরের ডালে উঠে পাতা পাড়তে হয়। বয়সও হয়েছে। শেষে অনেক ভেবে একটা বুদ্ধি বার করল ঘোড়া। সে পেয়ারা গাছের উপরের দিকের ডালেই থাকতে শুরু করল। শুধু পেয়ারা পাতাই খায়, তাই আলাদা করে আর পেয়ারা পাতা চিবোতে হয়না তাকে।

মজার কথা এই যে, ঘোড়া আগে থেকে যা বুঝতে পারেনি, তার সব কষ্টেরও শেষ হল এতে। গল্পের ঘোড়া গাছে থাকছে বলে রাজ্য শুদ্ধ সবাই আজকাল তাকে দেখতে ভিড় করে। হয়তো দিনরাত ওই পেয়ারা পাতা খাওয়ার কারণেই তার দাঁত ব্যথাও কমে গেল। আর, অত নিচ থেকে, মাটি থেকে গাছের ডালে ঘোড়াকেই বুঝে নিতে হয় বেশ ঠাহর করে, তার মাড়ি বা দাঁত তো অনেক দূরের কথা। তাই রসময়ের নাচ দেখতেও কেউ আসে না, আসবে কি, দেখতেই তো পায় না। উৎসাহের অভাবে রসময়ের নাচও গেল কমে। রসময়ের কথা সবাই ক্রমে ভুলেই গেল। ধীরে ধীরে ঘোড়ার একটা নামও জুটে গেল, 'গাছে চড়া ঘোড়া'। এত কিছুর পরে, এত বয়সে এসে শেষ অব্দি একটা নাম জুটল তার। তাকে আর কেউ 'রসময়ের মাড়ি' বলে ডাকেনা। ঘোড়া বেশ ভালোই আছে, সব দিক দিয়েই শান্তিতে।

ঘোড়ার শান্তির কথা বলতে বলতে, রাতও হয়েছে, চারদিক বেশ নিস্তব্ধ, দীপঙ্করও বেশ শান্ত চুপচাপ হয়ে পড়েছিল। আনমনা। হঠাৎ খেয়াল এল তার দিয়ার কথা। ও ঘুমিয়ে গেছে। গল্পের শেষটা শোনার আগেই ও ঘুমিয়ে পড়ল কিনা বুঝতে পারল না দীপঙ্কর।